OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 112 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 112 - 119
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শিশু মনের কথাকার মহাশ্বেতা দেবী

ড. আমিনা খাতুন
বাংলা শাখা মুখ্য, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়
Email ID: aminaamu2223@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Children literature, distinct imaginative space. critical awareness, social commitment.

Abstract
Shishu Shahityik 'Mahasweta Devi' - this phase may initially surprise readers, as her name is most often associated with a powerful voice of resistance and social justice. She is widely recognized for representing the struggles of marginalized communities and for blending activism with literature to create a force of human awakening. Celebrated for works such as Aranyer Adhikar, Hajar Churashir Maa and Draupadi, it may seem unlikely that such a writer also contributed significantly to children's literature. Yet, Mahasweta Devi wrote extensively for young readers, producing remarkable works like Armani Chanpar Gachh (1968), Ganga Theke Sagar (1975), Birsa Munda (1981), Bagha Shikari (1986), Tutul (1991), and Dakate Kahini (1998). A closer reading of these stories reveals that she did not rely on conventional fairy-tale motifs of kings, queens, and magical abundance. Instead, she narrated the lives of ordinary people—especially those who, though seemingly simple, possess extraordinary courage and humanity. Their stories, grounded in reality and are no less engaging or adventurous than fairy tales. Her primary literary identity remains rooted in protest and social commitment, her children's writings create a unique imaginative space shaped by empathy, realism, and deep human values.

This article This article is a humble attempt to shed light this relatively unexplored dimension of Mahasweta Devi, bringing attention to her remarkable yet often overlooked contribution to children's literature.

Discussion

'শিশু সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী' কথাটি পাঠকবর্গকে চমৎকৃত করতে পারে, কারণ সাধারণভাবে 'মহাশ্বেতা দেবী' - নামটি উচ্চারণ মাত্রই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন এক ব্যক্তিত্বময়ী প্রতিবাদী চেহারা, যার সামনে খ্যাতনামা সাহিত্যিক, নামকরা রাজনীতিবিদ থেকে বড় বড় পদাধিকারীরা কথা হারিয়ে ফেলেন, যার উৎসাহে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে বসবাসকারী শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আবার নতুন উদ্যোমে অস্ত্র ধরার শক্তি পায়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অগণিত আদিম অধিবাসীরা মানুষ পরিচয়ে বাঁচার নতুন মন্ত্রে জেগে ওঠে, প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়,

সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-ধর্ম সবদিক দিয়ে সর্বাধিক অত্যাচারিত শ্রেণী নারীরা বিদ্রোহের মশাল বুকে জ্বালিয়ে রাস্তায় নামার স্পর্ধা দেখায়। বাস্তবেই মহাশ্বেতা দেবী মানেই একটি ভিন্নতর সাহিত্যযুগ, একটি বিদ্রোহ। বর্তমান বিশ্বে তাঁর পরিচয় এক 'গণ্ডিভাঙা মানুষ রূপে'। সব্যসাচী লেখক মহাশ্বেতা দেবী আদর্শে, মনন শক্তিতে, প্রতিবাদে, মানব কল্যাণে - সবদিক দিয়েই ব্যতিক্রমী এবং অতুলনীয়, যিনি activism-কে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতীয় সাহিত্যে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তাঁর লেখনী অত্যাচারিত মানুষদের মাঝে অবস্থান ও অধিকারগত সচেতনতা আনার সাথে সাথে শিক্ষিত সমাজকে উপেক্ষিত মানুষদের সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করিয়েছে। 'অরন্যের অধিকার', 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর', 'কবি বন্দ্যঘটিগাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'হাজার চুরাশির মা', 'টেরোড্যাকটিল, পূরনসহায় ও পিরথা', 'শালগিরার ডাকে', 'শিশু', 'হুলমাহার মা', 'নুন', 'সিধুকানুর ডাকে', 'দ্রৌপদী', 'অপারেশান বসাইটুডু', 'হরিরাম মাহাতো'-এর মতো কালজয়ী প্রতিবাদী উপন্যাস, ছোটগল্পগুলির জন্মদাতা লৌহসদৃশ গম্ভীর ব্যক্তিত্বধারী এই লেখক শিশুদের জন্যও লিখতে পারেন বা লিখেছেন এমন ভাবনাটা পাঠকদের কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়। অথচ জানলে আশ্চর্য হতে হয় যে তিনি ছোটদের জন্যও প্রচুর লিখেছেন এবং সেগুলির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম। তিনি যখন শিশুদের জন্য লিখতে বসেছেন তখন শিশু সাহিত্যিকদের মতোই বড় আন্তরিকতার সঙ্গে এক বুক ভালোবাসা নিয়ে এক অন্যজগত নির্মাণ করেছেন যা পড়তে গিয়ে তাঁর চিরপরিচিত এই বিদ্রোহী রূপটি ঝাপসা হয়ে ওঠে। ভাবতে অবাক লাগে মহাশ্বেতা দেবীর এই দূর্লভ বাল্যদৃষ্টির কথা কিভাবে সবার অদেখা থেকে গেল। তাঁর এই বাল্য দৃষ্টির জন্ম কিন্তু সেই ছোট্ট বয়সেই, শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর আশ্রয়ে (১৯৩৬-৩৮)। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত, সাহিত্য, ছবি আঁকার উমুক্ত জীবন, বিশেষ করে এখানকার শিশুবিভাগের সাহিত্য চর্চা ছোট্ট মহাশ্বেতার মাঝে যেমন কলম চালানোর অভ্যেসটা গড়ে দিয়েছিল, আর যার বশে পরবর্তীকালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর বিশাল বিস্তৃত সাহিত্য সাম্রাজ্য, সঙ্গে শিশুমনের ভাবনার জগতটাকেও খুলে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। আমরা জানি মহাশ্বেতা দেবী এক স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক যার কাছে সাহিত্য রোমান্টিক কল্পনাবিলাস নয়, মানব জাগরণের আধার। আর এই একই লক্ষ্যে অটল থেকেই শিশুসাহিত্যগুলি রচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর অভ্যস্তভঙ্গী সরে এসে এক অন্যজাতের, অন্যস্বাদের জগত গড়ে তুলেছেন যা পড়তে গিয়ে চমকিত হতেই হয়। আমার এই নিবন্ধটি মহাশ্বেতা দেবীর সেই অনালোচিত সাহিত্য ভান্ডার তথা তাঁর সেই অদেখা রূপটির প্রতি আলোকপাত করার এক চেষ্টামাত্র।

আসলে প্রতিটি মানুষের মাঝেই থাকে নানা রূপের সমাহার, চরিত্রের নানা শেড। সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী দ্বৈত সত্তা সমন্বিত অনেক মানুষকে আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ করতে পাই। উদাহরণ হিসেবে এককালের জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের নায়ক 'শক্তিমান'-এর কথাই ধরা যাক। বোকা সাধাসিধে গঙ্গারামকে সুপারহিরো শক্তিমান হিসেবে দেখলেই রোমাঞ্চিত হতে হয়, বা বাস্তব জীবনে বেঙ্গল ক্যামিকেলের গুরুগম্ভীর পদকর্তাটিই যিনি বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসাত্মক লেখক 'পরশুরাম' হয়ে তার অদ্ভুত কুঠারের সুড়সুড়িতে সমগ্র বাঙালি পাঠক থেকে শুরু করে রামগরুড়ের ছানাদেরও হাসতে বাধ্য করিয়েছিলেন ভাবলেই অবাক হতে হয়। আমরা যারা পাঠক তারা মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে খুব কম জানি। গম্ভীর, রুক্ষ এই মানুষটি আদতে ছিলেন অসম্ভব মজাদার এক মানুষ। তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, প্রিয়জনদের তাঁর সম্পর্কে বলা কথার মাঝে তাঁর এই অদেখা রূপটি উঠে এসেছে অনেক জায়গায়। আসলে জীবন কাহিনীময়, জীবনের পথে চলতে গিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের মাঝে চাপিয়ে দেয় রুক্ষতার নানা পরত। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য থেকে 'মহাশ্বেতা দেবী'তে উত্তরণের ইতিহাস কোন কল্পকাহিনীর থেকে কম নয়, এর পেছনে রয়েছে এক কঠিন আত্মত্যাগ, টিকে থাকার দৃঢ় লড়াই, কঠোর সাহিত্য সাধনা এবং এক নিরলস পথ চলা, আর এই পথ চলতে চলতেই তাঁর বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। বিখ্যাত লেখক কন্যা হয়েও (তিনি কল্লোল যুগের অন্যতম স্বনামধন্য কবি মনীশ ঘটকের কন্যা) সাহিত্য মহলে নিজের একটা স্থান করে নিতে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁকে। এর উপর পেটের জন্য লড়াই তো ছিলই। জীবনের জটিলতার আবর্ত তাঁকে রূঢ়, গম্ভীর করে তুললেও তাঁর সেই সবুজ সতেজ শিশুমনটাকে অভিজ্ঞতার তাপ নষ্ট করে ফেলতে পারেনি, শামুকের খোলসের মাঝে অমলিন অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। মহাশ্বেতাদেবীর শিশুদের জন্য রচিত গল্প-উপন্যাসগুলি হল মূলত তাঁর সেই লুকিয়ে থাকা সরল মানুষটির নির্মল বহির্প্রকাশ, যা মনকে আপ্লুত করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 112 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমার বিশ্বাস করি মহাশ্বেতা দেবী যদি অ্যাক্টিভিস্ট লেখক না হতেন তাহলে শিশু সাহিত্যিক অবশ্যই হতেন। পাঠকরা মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পের সম্ভার দেখলে হয়ত অনেকেই আমার সঙ্গে এক মত হবেন। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন—

> " 'ছেলে ভোলাতে পাকা' গল্প বলিয়ে হয়ে গেছি। এ আমার হতেই হোত। নিজের এতগুলি ভাই বোন, মামা, কাকা, পিসি, মাসি, সকলের ছেলে মেয়ে একটা রীতিমত ফৌজকে গল্প বলে খাওয়াতাম, ঘুম পারাতাম। সকলের মধ্যে নবারুণ ছিল গল্প শুনিয়ে একজন।" (মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, খন্ড নং - ১৬, ভূমিকার পরিবর্তে)।

আসলে আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যাক্টিভিস্ট মহাশ্বেতা দেবী সম্পূর্ণাংশে এক রক্ত মাংসের মানুষ, আর পাঁচটা মেয়ের মতোই তিনিও মেয়ে ও এক 'মা', অন্যান্যদের মতোই তাঁর জীবনের শুরু। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান নবারুণকে বড্ড ভালোবাসতেন (আমি কথাটি তাঁর লেখা ও বক্তব্যের ভিত্তিতে বলছি), এমনকি পরবর্তীকালে আদিবাসীদেরও নিজের সন্তানরূপেই স্নেহ করেছেন, তাঁর এই মমত্ববোধ তাকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়ায়ে নিয়োজিত করেছে। মা না হলে এমন এক অগ্নিযজ্ঞে নিজেকে সমর্পণ করা যায় না। সে যাই হোক, দুষ্টু নবারুণকে বাগে আনতে তাঁর গল্প বলা শুরু। তিনি বিশ্বাস করতেন বাচ্চাদের গল্প বলাটা খুব প্রয়োজন, কারণ শৈশবে যারা গল্প শোনে তারাই বড় হলে বই পড়ুয়া হয়। আর এই কারণে সন্তান নবারুণের মতো সকল বাচ্চাকে ভবিষ্যতের পড়ুয়া বানানোর জন্য গল্প লেখা শুরু করেন। কখনও ইতিহাসের বইয়ের পাতা থেকে, কখনওবা নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বাক্স হাতড়ে তিনি তাঁর শিশুসম্ভার গড়ে তুলেছেন। তাঁর গল্পে এসে ভিড় করেছে কল্পনার বর্ণময় জগত, পশুপাখীর প্রতি সহমর্মিতা, দুঃসাহসিক অভিযান, ইতিহাসের নানা অজানা তথ্য, ছোটবেলার নস্টালজিক নানা বিষয় এবং সর্বোপরি মানুষের গল্প। আসলে তাঁর গল্পগুলি হল শিশুমনের ভয়কে জয় করার কাহিনী। জ্ঞান ও অনুভূতির মেলবন্ধনে তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সংরক্ষণের অভাবে তাঁর শিশুদের জন্য লেখা অনেক রচনাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তবে 'মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র'-এর সম্পাদক অজয় গুপ্ত মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ, যার প্রচেষ্টায় এই সমগ্রের 'কিশোর-সম্ভার' নামক ১৬ নং খণ্ডটি আমাদেরকে মহাশ্বেতা দেবীর লেখা শিশুসাহিত্যিক ভান্ডারের সঙ্গে কেবল পরিচিতই করে না, এক অচেনা অজানা সাহিত্যিকসত্ত্বার সাথে মানবীসত্ত্বাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে যার খবর খুব কম লোকের জানা।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম প্রকাশিত শিশু গ্রন্থের নাম হল 'পথ চলি আনন্দে' (২৫শে বৈশাখ, ১৯৫৯)। এই বইয়ে তিনি জনপ্রিয় আলাদিনের গল্পটি যেখানে শেষ হয়েছিল তারপর থেকে নতুন করে লিখেছেন। জীবনের বহু সময় অতিক্রম করে বৃদ্ধ আলাদিন মৃত্যুর আগে কোন যোগ্য মালিকের হাতে জাদুর প্রদীপটি তুলে দিতে চান, যাতে সেটি সমাজের কল্যাণব্যতীত কারো অনিষ্টের জন্য কেউ ব্যবহার করতে না পারে। যোগ্য উত্তরাধিকারীকে খুঁজতে তিনি সেই সুদূর চীন থেকে পাড়ি দিয়েছেন নানা দেশে, আর আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছি সেসব দেশ, জেনেছি সেদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে আরো কত মূল্যবান তথ্যকে। চীন থেকে সে গেছে তিব্বতে, জানতে পারলাম মহান বিদ্যাভিক্ষুক হিউয়েন্ সাং যাত্রা পথে টুনহুয়াং নামক যে স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সেটি এই তিব্বতেই অবস্থিত, জানতে পারি অষ্টাদশ শতকে তরুণ রামমোহন রায় সেখানে গিয়ে কিভাবে কঠিন বিপদে পরলে তিব্বতি মেয়েদের দয়াতে তাঁর জীবন রক্ষা পায়। তিব্বত থেকে ইয়ারকন্দ, আফগানিস্থানের কান্দাহার, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান ঘুরে আলাদীন এসে হাজির হয় গরীব বাঙলার বুকে। বাপ-মা হারা তিন শিশু ভাই বোন আদরে বরণ করে নেয় তাকে। তাদের দারিদ্রতা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। ঘরে খাবার না থাকলেও মানুষকে তারা ভালবাসতে জানে।

> "আনন্দে বুড়োর চোখ ছলছল করে। বলে - আমিও অনেক শিখলাম তোমাদের কাছে। ...ভাইবোনরা ঘুমিয়ে পড়ে। বুড়ো তার প্রদীপটি বের করে ঝোলা থেকে। খুব যত্ন করে সলতেটায় আগুন দেয়। নিবাত নিষ্কম্প জ্যোতিতে ঘরটা ভরে যায়। বুড়ো বলে- পূণ্যদেশ ভারতভূমি-তারই এক কোণায় ক-টি গরিব ছেলেমেয়ের ঘরই আমার মনে হল - তোমার শ্রেষ্ঠ জায়গা। তাই তোমাকে এখানে রেখে গেলাম...।" (মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, খন্ড নং - ১৬, পৃঃ - ৪৯)।

গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমরা যেন রূপকথার দেশে চলে যাই। বুড়ো আলাদিনের সঙ্গে আমাদেরও খোঁজের শেষ হয়।

মহাশ্বেতা দেবী বিভিন্ন লেখার ফাঁকে সময় পেলেই লিখে গেছেন শিশু-কিশোরদের জন্য একের পর এক গল্পগ্রন্থ, যেমন - আরমানি চাঁপার গাছ (১৯৬৮), গঙ্গা থেকে সাগর (১৯৭৫), বিরসা মুণ্ডা (১৯৮১), বাঘা শিকারি (গল্প-সংকলন, ১৯৮৬), তুতুল (১৯৯১), ডাকাতে কাহিনি (গল্প-সংকলন, ১৯৯৮) প্রভৃতি। তাঁর গল্পগুলো পড়তে গিয়ে একটু খেয়াল করলে নজরে আসে তিনি রূপকথার মতো রাজ রাজাদের কাহিনী লেখেন নি, লিখলেও রূপকথার মতো প্রাচুর্যের চমক তাদের নেই। তিনি বাচ্চাদের শুনিয়েছেন সাধারণ মানুষের গল্প, বিশেষ করে যারা সাধারণ হয়েও অসাধারণ সেই সব মানুষের কথা, যাদের গল্প অবশ্য রূপকথার থেকে কম রোমাঞ্চকর নয়। 'আরমানি চাঁপার গাছ' গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় সন্দেশ পত্রিকায় তিন কিস্তিতে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে, সেখানে আমরা দেখি ছোট্ট দশবছরের অসুস্থ 'মাতো' তার ছাগলছানা অর্জুনকে ভন্ড কাপালিকের দুষ্টু অভিসন্ধির হাত থেকে বাঁচাতে অজস্র মানুষের ঘেরাটোপকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে ছাগলছানাকে বুকে নিয়ে ভাদ্রের তপ্ত দুপুরের আগুনকে তাচ্ছিল্য করে, অভুক্ত অবস্থায় পথ মাঠ ঘাট সব পেরিয়ে গীর্জার মধ্যে ঢুকে পরে আরমানি গাছের নীচে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর আর কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারে না। আরমানি গাছ বড় ভালোবাসায় তাকে বুকে টেনে নেয়। রক্ত দেখে ভয় পেতে থাকা ছোট ছেলেটি কোথা থেকে এত শক্তি পেয়েছিল মাতোর মা শুধু অবাক নয়নে ভাবতে থাকেন। গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অসাধারণ বর্ণনায় মাতোর মৃত্যুর যন্ত্রণা আরমানি গাছের ভালোবাসার ছায়ায় কোথাও ঢাকা পরে যায়। মৃত্যুও যে এত সুন্দর হতে পারে ভাবতেই মন ভালো হয়ে ওঠে। হয়ত মৃত্যুর নির্মমতাকে তুলে ধরে তিনি শিশু মনে আঘাত করতে চান নি।

তাঁর 'বাঘা শিকারি' গ্রন্থটি কুড়িটি গল্পের সংকলন। ভূমিকায় লেখিকা নিজেই জানিয়েছিলেন -

> "এই বইয়ে ছোটদের জন্য লেখা বিভিন্ন স্বাদের কুড়িটি গল্প একত্রিত করা হয়েছে। প্রত্যেক গল্পই দেবে পাঠক-পাঠিকাদের সমান আনন্দ।"

বাস্তবেই এর প্রতিটি গল্পই স্বাদ ও রঙে সম্পূর্ণ আলাদা - এতে যেমন আছে এ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ, আছে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের গা ছমছমে আতঙ্ক, আছে মনকে ভালো করে দেবার মতো সরসতা, সর্বোপরি শিশুমন জয় করার নির্মল আনন্দ। এখানে আমরা দেখি চালাক কুমোর অঘনু কিভাবে বোকা রাজাকে ঠকিয়ে তার অর্ধেক রাজত্ব দখল করে নেয় (চালাক কুমোর বোকা রাজা), দুষ্টু রাজাকে জব্দ করে কিভাবে পাখি মায়ের চার সন্তান (বাঘ, সাপ, একশিং ঘোড়া আর মানুষ) মস্তো বড়ো রাজ্যের রাজা হয়ে পরম সুখে বাস করতে থাকে আর দুষ্টু রাজা শেষে বুঝতে পারে 'নির্দোষীকে কষ্ট দিতে গেলে এমনি শাস্তিই পেতে হয়' (চার ভাই), রামলাল সর্দার (যে অসম্ভব সাহস আর শিকারের ক্ষমতার জন্য বাঘা শিকারি নামে সকলের কাছে পরিচিত)-এর ছেলে, ছোট্ট উমনো, কিভাবে সাহসের সাথে বদমাশ মঙ্গলকে যে ফরেস্ট অফিসারদের কাছে ধরিয়ে দেয় (বাঘা শিকারি), ছোট ছেলে ধানুয়া কিভাবে টিকটিকি(নাম বুদ্ধিমান)-র সাহায্যে জঙ্গলের বাঘকে শায়েস্তা করে গ্রামে ফিরে আসে (বুদ্ধিমান টিকটিকি) প্রভৃতি। এছাড়া এতে আমরা অনেকগুলো ভূতের গল্প পাই, যেমন - 'ভারেঙ্গার ভূত', 'ঝারোয়ার জঙ্গলে', 'ভুলো ভূত', 'রাত ভূতুরে' প্রভৃতি। ঝারোয়ার জঙ্গলে লোক আর কেন যায় না তার কারণ জেনে সতিই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

১৯৯১ সালে শারদীয় 'সকালে' প্রকাশিত 'তুতুল' গল্পগ্রন্থটি আমার খুব প্রিয় দুটি কারণে, এক - এটি আমাদের মহাশ্বেতা দেবীর ছোটবেলার সঙ্গে পরিচয় করিতে দেয়, আর অন্য কারণটি হল লেখিকা বইটি যে জায়গাকে উৎসর্গ করেছেন (বহরমপুরের 'ধরিত্রী' বাড়ি), লেখার ফাঁকে ফাঁকে যে জায়গাটি (বহরমপুর) বারবার উঠে এসেছে সে জায়গার মেয়ে আমিও। ফলে কোথাও একটা আত্মিক টান অজান্তেই তৈরী হয়ে যায়। লোকের কোথা রাখতে বইটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর বাবা মনীশ ঘটককে নিয়ে। বইটিতে ব্যক্তি মনীশ ঘটকসহ মহাশ্বেতা দেবীর ছোটবেলার বহু ঘটনা এবং তাঁর পরিবারের নানা লোকজন, বহু গুণীজন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য উঠে এসেছে। অনেকেই হয়ত জানেন না মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বাবা মনীশ ঘটককে 'তুতুল' বলে ডাকতেন, তাঁর এই ডাকের পেছনের কারণ বলতে গিয়ে তিনি এক মজেদার ঘটনা আমাদের শুইয়েছেন - ছোটবেলা থেকেই মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন বইয়ের পোকা ছিলেন। মেটারলিঙ্কের লেখা নাটক 'ব্লু বার্ড' (স্বর্গত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যার অনুবাদ করেছিলে 'নীল পাখী' নামে) বইয়ে দুটি শিশুর নাম ছিল তিলতিল আর মিতিল। মনীশ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 112 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘটক তাঁকে আদর করে তিলতিল থেকে তুতুল বলে ডাকতেন। আর ছোট্ট মহাশ্বেতার স্বভাব ছিল তাঁকে যে যে নামেই ডাকত তিনিও তাদের সেই নামেই ডাকতেন। আর এভাবেই তিনিও বাবাকে তুতুল বলে ডাকতে শুরু করে দেন। মেজকাকাকে 'মমতাজ' ডাকার কারণও সেই। 'তুতুল' গল্পের সুবাদে জানতে পারি মনীশ ঘটক কেবল বড় লেখকই ছিলেন না, তিনি বড় শিকারীও ছিলেন এবং বাঘ শিকারও করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রপরিচালক কাকা ঋত্বিক ঘটক (ডাক নাম ভবা, মহাশ্বেতা দেবী আজীবন বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, লেখায় তাঁর জীবনে এই মানুষটির প্রভাবের কথা বারবার স্বীকার করে গেছেন) তাঁর থেকে বয়সে মাত্র দুমাসের বড় হওয়ায় তাদের মধ্যে কাকা-ভাইজী সম্পর্ক কম বন্ধুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। জানতে পারি ভবা ও তাঁর জমজ বোন ভবী (প্রতীতি)-সহ মহাশ্বেতা দেবীর কাকা, পিসি আর অজস্র ভাইবোনে ঘেরা ছোটবেলার প্রচুর মজাদার কাহিনী, যেমন - কিভাবে সাঁতার না জেনে জলে ঝাঁপ দিয়ে তার মরো মরো অবস্থা হয়েছিল, গিনি লজেন্স, সিগারেট লজেন্স ভাগ করে খাওয়ার গল্প, সিগারেটের মতো দেখতে সিগারেট লজেন্স থেকে গিয়ে ভবা অর্থাৎ ঋত্বিকের কানমলা খাওয়ার গল্প, বহরমপুর, শান্তিনিকেন, মেদনীপুরের নানা স্মৃতি আর আছে তাঁর এ্যাক্টিভিস্ট মায়ের নানা কর্মকান্ডের সঙ্গে তাঁর পোশা বাছুর 'ন্যাদোশ'কে নিয়ে মজাদার সব গল্প, যা পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি 'গোরু একটি গৃহপালিত পশু' গল্পটির বিষয়বস্তু তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন। আর আছে ঋত্বিক ঘটকের হুট করে সবাইকে ছেড়ে পরলোকে চলে যাওয়ার যন্ত্রণাঘন সেই মুহূর্তের বর্ণনা, যা মনকে স্তব্ধ করে দেয়।

> "আর বড়ো হবার পর ভবা যখন ঋত্বিক, সে সময়ের সরস গল্প যারা জানত অনীশ-অবু (অবু বলত রিটুইক) ফল্গু, তারা বা কোথায়। সকলেই একে একে চলে গেছে আমাদের ছেড়ে। আমিও তো তখন কলকাতায় বেশি থাকি, নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত।" (মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, খন্ড নং - ১৬, পৃঃ - ৩৫৬)

এই রকম বাল্যাবস্থার হাসি কান্না, নানা রঙ্গের স্মৃতির প্রতিচ্ছবি এই বইটি। পড়তে গিয়ে মন যেমন আনন্দে ভোরে ওঠে আবার কখনো চাপা যন্ত্রণায় ভারী হয়ে আসে নিঃশ্বাস। শেষে এটুকু বলতে পারি, যারা মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন বা করতে আগ্রহী তাদের এই বইটি লেখিকা সম্পর্কে জানতে প্রচুর সাহায্য করবে।

'গঙ্গা থেকে সাগর' (১৯৭৫) গ্রন্থটি মূলত ইতিহাস আশ্রিত গল্প ও লেখার সংকলন। এটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর সহায়ক পাঠ রূপে লিখিত। ইতিহাস মহাশ্বেতা দেবীর প্রিয় বিষয় আর সারাজীবন মানুষের সত্য ইতিহাসকেই সাহিত্যে নির্ভেজাল ভাবে তুলে ধরার সাধনা করে গেছেন। তিনি জানতেন শিশুদের এক আদর্শ নাগরিক তথা মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের জীবন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে তাদের সামনে দেশের প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃত ইতিহাস বলতে তিনি মূলত বুঝিয়েছেন - 'সাধারণ মানুষের জীবনে একটি বিশেষ যুগ, একটি বিশেষ প্রভাব, কোন যুগপুরুষ কী-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, সাধারণ মানুষের জীবনে তার ফলে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাই হল প্রকৃত ইতিহাস। অর্থাৎ রাজবৃত্ত, গণবৃত্ত – এ দুয়ের সমন্বিত ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস'। 'গঙ্গা থেকে সাগর' বইটির ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব এবং তার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> "আজ আমার মনে হয় আমাদের দেশে যেভাবে সাহিত্য পড়ানো হয়, তাতে ইতিহাসের ভূমিকাটুকু একেবারে বাদ থাকে বলে শিক্ষার্থীর মনে কখনোই সাহিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বোধ জাগ্রত হয় না। সাহিত্য পঠনপাঠনকালে দেশের ইতিহাস জানা আবশ্যিক। কেন না সাহিত্যের বিষয়বস্তু যাইহোক কেন, লেখক সমকালের সমাজ ও ইতিহাসের মানুষ। সময়ের ইতিহাস জানা থাকলে পাঠ্য সাহিত্য আরও বোধ্য ও আয়ত্তসাধ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' পড়তে হলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, মুক্তি সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস না জানলে বইগুলির সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ কি করে সম্ভব?" (মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, খন্ড নং - ১৬, পৃঃ - ৮৫)

গ্রন্থটি মূলত 'বাংলার ইতিহাসের এক সামগ্রিক রূপ', প্রচুর অজানা তথ্যের সংগ্রহশালা, আমার মনে হয় প্রতিটি শিক্ষার্থীদের বইটি পড়া উচিত। আমরা বইটি পড়তে গিয়ে পাই – রেশম শিল্পের প্রচীনত্ব বিষয়ে বিদ্বান, গবেষক, মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৌলিক মতবাদ, রাজা শশাঙ্কের রাজধানী সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বিজয় সেন, চৈতন্যদেব

প্রমুখ মনিষীদের গৌরবময় ইতিহাসকে। শিক্ষিকা মহাশ্বেতা দেবী শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি খুব ভালো করেই জানতেন। জানতেন শৈশবকালই হল একটি শিশুকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রকৃত সময়। আর সেই লক্ষ্যেই ইতিহাসের জটিল ঘটনাবলীকে শিশুদের বোধগম্য করে এমন সরল সহজ ভাষায় তিনি তুলে ধরেছেন যা বড়োদেরও আকর্ষিত করে, অবিভূত হতেই হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাস তথ্যসমৃদ্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তার শিশুদের জন্য লেখা ‘বিরসা মুন্ডা’ উপন্যাসটির কথা অবশ্যই আলোচনা করতে হয়। ১৯৭৯ সালে ঔপনিবেশিক শক্তি ও সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাত্র ২৫ বছর বয়সী এক মুন্ডারি যুবক বিরসা মুন্ডার জীবনদাত্রী অরণ্যের উপর থেকে তাদের কেড়ে নেওয়া অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃসাহসিক এক লড়াইয়ের কাহিনীকে আশ্রয় করে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি, যার জন্য তিনি পরবর্তীকালে ‘অ্যাকাডেমি পুরস্কার’ দ্বারা সম্মানিতও হয়েছিলেন। এক আদিবাসী যুবকের নির্ভীক আত্মত্যাগের কাহিনী তিনি বাচ্চাদেরও বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জানতেন ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটির ভাষা ও বিষয় বোঝার মতো পরিপক্কতা তাদের মাঝে নেই। তাই বড় যত্ন করে ‘প্রচন্ড বিস্ফোরক’ সে অভিজ্ঞতাকে সহজবোধ্য করে ছোটদের জন্য লিখলেন ‘বিরসা মুন্ডা’ গল্পটি। স্বীকার করতেই হয় তাঁর মতো করে কেউ আগে বিরসা নামক সাধারণ যুবকের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প শোনায় নি।

> “এটি কিসের গান?
> উলগুলানের গান।
> উলগুলান কী?
> মুন্ডাদের বিদ্রোহ।
> সে কোন বিদ্রোহ?
> বিরসা ভগবানের বিদ্রোহ।
> বিরসা কি ভগবান? বিরসা কি মানুষ? বিরসা আজ ওদের কাছে ভগবান। ...’ভগবানই মুন্ডা জাতিকে যুদ্ধ করতে নামিয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে। ...বিরসার নাম আজও আদিবাসিদের প্রেরণা দেয়।” (মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, খন্ড নং-১৬, পৃঃ- ১৯৫-১৯৭)

বাংলা সাহিত্যে শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙ্গালির সাহিত্যমনস্কতার নেপথ্যে শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যময় শিশুসাহিত্যের ভূমিকাকে কোন মতেই অস্বীকার করতে পারি না। সপ্তম শতকে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শিশুসাহিত্যের জন্ম। শৈশব শেখার বয়স, এই সময় শিশুদের ধর্ম বা নীতিশিক্ষা দিলে ফলদায়ক হবে - এমন লক্ষ্য নিয়ে শিশুসাহিত্য রচনার এক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ব্রিটিশ অধীন বাংলায়। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বাংলা প্রথম মাসিক পত্রিকা ‘দিগদর্শন’ - যাকে খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর ‘শতাব্দীর শিশু সাহিত্য’ গ্রন্থে প্রথম কিশোর পাঠ্য সাময়িক পত্রিকা বলে অভিহিত করেছেন। ১৮৬০ সালে ‘খৃশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি’র উদ্যোগে বাংলার প্রথম শিশু-কিশোর পত্রিকা ‘সত্যদীপ’ প্রকাশিত হয়। তবে মিশনারি থেকে এদেশীয় সকলেই ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষামূলক পাঠ্যবই রচনার মাঝেই মূলত শিশুসাহিত্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন। তবে একসময় পাঠ্যবই ও নীতিশিক্ষামূলক গল্পের সৌধ থেকে শিশুসাহিত্য ‘শিশু ও কিশোরদের মনের উপযোগী ও উপভোগী সাহিত্য’ রূপে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব পথ তৈরী করে নেয় সখা, বালক, সাথী, মুকুল, সখী প্রভৃতি পত্রিকার হাত ধরে। বাঙালি পাঠক ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝোলার হাত ধরে রূপকথার নতুন সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। সন্ধ্যে বেলায় মা-ঠাকুমার কোলে বসে শোনা রূপকথার জগৎকেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম হাজির করেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তারপর প্রবোধ সান্যাল, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় প্রমুখরা শিশুসাহিত্যকে পৌঁছে দেন এক অন্যস্তরে। এনাদের কলমের স্পর্শে শিশুসাহিত্য হয়ে ওঠে পালতোলা সেই নৌকা, যার মধ্যে শিশু কিশোর থেকে সব বয়সের মানুষ শিশুবয়সের অসম্ভব ভাললাগার মনটি নিয়ে কল্পনার এক ভিন্ন জগতে ভেসে বেড়াতে পারে অনায়াসে। মহাশ্বেতা দেবী এনাদের রচনা, বিশেষ করে লীলা মজুমদার কর্তৃক ভীষণ ভাবে প্রভাবিত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 112 - 119
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছিলেন সেকথা তাঁর 'চেতনায় দুই বিশ্ব' নামক প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি। মহাশ্বেতা দেবীর শিশু সাহিত্য লেখার পেছনে এইসব শিশু সাহিত্যিকদের অবদান আমরা অস্বীকার করে পারি না।

তবে মহাশ্বেতা দেবীর গড়ে তোলা এই শিশু জগত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। তাঁর রচনাগুলি পাঠ করলে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমাদের নজর কাড়ে - প্রথমত, তাঁর রচনায় নীতিকথা আছে, কিন্তু তা আকারে প্রকট নয়, বরং মজাদার, শিশুদের মনগ্রাহী করেই তিনি তা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর লেখায় উদ্ভট কল্পলোকের মায়াজালের তুলনায় বাস্তবতার ছোঁয়াই বেশী, কিন্তু সে বাস্তবতায় দুঃস্থ পৃথিবীর রুক্ষতা বা কাঠিন্য নেই। আসলে তিনি বানানো গল্প আর মিথ্যের মধ্যকার পার্থক্যটি জানতেন, আর তাই তিনি শিশুদের মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চান নি। সত্যিকে তাদের মতো করে শোনাতে চেয়েছেন। সত্যকে স্বীকার করার এবং সত্য বলার সাহসটাও জুগিয়েছেন। তৃতীয়ত, মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় ভাষার লাবণ্যময়তা বা চিত্রময়তার পাশাপাশি যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহল সাবলীল, স্পষ্ট, ঋজু ও সংযত গদ্য। তবে কোন কোন সময় ভাষার দুর্বোধ্যতা শিশুদের গল্পরস উপভোগে বাধার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্দেহ নেই। চতুর্থত, বিভিন্ন অজানা ও মূল্যবান তথ্যের আকর তাঁর গল্পগুলি। পাঠকরা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, দেশী-বিদেশী প্রচুর বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে। যেমন, রেশম আবিষ্কারের চমকপ্রদ তথ্য, ইয়ারকন্দের পশ্চিমে অবস্থিত পামির দেশ, রাশিয়া, আফগানিস্থান থেকে এশিয়া মহাদেশের নানা রহস্য, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বাঘা শিকারি নামক একদল অবলুপ্ত আঞ্চলিক শিকারিদের কথা প্রভৃতি। পঞ্চমত, রূপকথার রাজাদের কল্পিত বীরত্বের গল্প নয়, আমাদের দেশের বিভিন্ন সংগ্রাম, তাদের পরিচিত ও অপরিচিত বিভিন্ন নায়ক - যেমন, শিবাজী, বিরসা, ক্ষুদিরাম প্রমুখের বীরত্ব, আত্মত্যাগের গল্পকে Inspirational পদ্ধতিতে শিশুদের শুনিয়েছেন তাদের মধ্যে এক Literary awareness গড়ে তোলার জন্য। ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয় হওয়ায় অতীত যেন কথা বলে তাঁর গল্পে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁকে পূর্ববর্তী সকল শিশুসাহিত্যিকদের থেকে আলাদা করে তোলে।

শিশুসাহিত্য সৃষ্টি সহজ কথা নয়। এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো লেখাটি কতটা শিশু উপযুক্ত হয়েছে তা বিবেচনা করা। শিশু মনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম সফল সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি তাই চ্যালেঞ্জের। শিশুদের জন্য লিখতে হলে নিজেকেও শিশুমনের হতে হয়। শিশুদের মন, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ বেদনা, হাসি-কান্নার উৎস বুঝতে হয়। এগুলো বুঝতে পারলেই সার্থক শিশুতোষ রচনা সম্ভব। কবিগুরুও শিশুদের জন্য লিখতে গিয়ে নিজের প্রাণকে সেই সময়ে নিয়ে গেছেন। এমনিতেই সারল্য ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তবে মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় এই সারলতা অনেক স্থানেই অনুপস্থিত তা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হয়। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল শিশুকালে যা পাঠ করি তার অনেকটা আবার আমরা কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যেও মনের কোণে ঠাঁই নেয়। এটাই সৃষ্টির সার্থকতা। মহাস্বেতাদেবীর গল্পে আমরা যে ইতিহাসকে পাই তা আমাদের কেবল অতীত সম্পর্কে সচেতন করে তা নয়, বরং প্রকৃত শিক্ষকের ন্যায় অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়বার মানসিকতা গড়ে তোলেন।

মহাশ্বেতা দেবী সর্বাংশেই একজন সমাজসচেতন লেখিকা, বর্তিকার মতো এক ভিন্নধর্মী পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে সমাজের বাস্তব, রূঢ়, নোংরা রূপটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। আমি আগেই বলেছি তাঁর শৈশবের কিছুটা সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে কবিগুর সান্নিধ্যে। আর তাই রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের শক্তি, মঙ্গল কামনার শক্তিকে আশ্রয় করে শিশুমানসে এক বিশ্বাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি সর্বদা। বড়দের মানবতাহীন বিবেকহীন মূল্যবোধহীন পৃথিবী থেকে ছোটদের শিশু মনটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন সাধ্য মতো। কারণ তারাই দেশের ভবিষৎ, তাঁর শোষনহীন সুস্থ ভারত গড়ার স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার। তাঁর ছোটদের জন্য লেখা গল্পগুলিতে আছে সুন্দরের দিকে চোখ মেলে দেওয়ার এক কমল আলোর কথা, সঙ্গে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াসও। বর্তমানের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শৈশব যখন সৃষ্টিশীল কল্পনার প্রতি বিমুখ, সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষণিক আনন্দের উপকরণের হাতছানিতে দিশেহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট, নানা অপরাধমূলোক কর্মকাণ্ডে জড়িত, এই রকম এক দুঃসময়ে মহাশ্বেতা দেবীর শিশু সাহিত্য শিশুমনকে সতেজ, সজীব, যুক্তিবাদী, ইতিহাসচেতা, আদর্শবাদী করে তোলার মহৌষধি হয়ে উঠতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকদের মতো মহাশ্বেতা দেবীর শিশুসাহিত্যিকসত্ত্বা প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত, খানিকটা উপেক্ষিত থেকে গেছে। ছোটদের ছোট খিদের মাপে তাঁর ভারী মনের খরাক এর অন্যতম কারণ। অসহায় মানুষদের হয়ে লড়তে গিয়ে ছোটদের লেখায় মনঃসংযোগ করতে পারেননি তিনি। সাহিত্যিক মূল্যের বিচারে না হলেও আদর্শগত দিক দিয়ে তাঁর গল্পগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বোপরি, লেখাগুলি আমাদের এক অপরিচিত মহাশ্বেতার সঙ্গে পরিচয় করায় কালের স্রোত যাকে কেড়ে নিয়েছিল। আসলে কর্মময় একটি জীবন, কত ধরনের তার অভিজ্ঞতা, যেন সমুদ্রসৈকত থেকে কুড়িয়ে রাখা নানা রঙের নুড়ির সমাহার। যখন যে কাজটি করেছেন, যা ভেবেছেন, তাঁকে নিজের মতো করে স্বকীয় আঙ্গিকে সংরক্ষণের চেষ্টাও করেছেন। শেষে এটুকুই বলতে পারি, তাঁর শিশুসাহিত্য সম্ভার হল রুক্ষ লাল নেড়া মাটির বুকে কয়েক পশলাবৃষ্টির ছোঁয়ায় গজিয়ে ওঠা সবুজ ঘাস, যা জীবনের রুক্ষতাকে ঢেকে দিয়ে মনকে সজীব নির্মল করে তোলে, নতুন আলোর দিশা দেখায়।

Bibliography:

দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র’, প্রথম খন্ড, সম্পাদনা-অজয় গুপ্ত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩

দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র’, ষোড়শ খন্ড, সম্পাদনা-অজয় গুপ্ত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রকাশ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫

খাতুন, হাসনারা, ‘রায়বাড়ি’র শিশু সাহিত্য, পত্রলেখা, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১ মে ২০১৫